সঠিক খাদ্যাভ্যাস

খাদ্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের শরীর খাদ্য নির্ভর। খাওয়া ছাড়া আমাদের বেড়ে ওঠা, সুস্থ থাকা, কাজকর্ম করা – কোনোটাই সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনেও খাদ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাওয়ার মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয়। খাবার খাইয়ে আমরা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের আদর–আপ্যায়ন করি, আনন্দ–উৎসবে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করি। খাদ্য আমাদের মনের আবেগের সঙ্গে যুক্ত; পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে খাবার আমাদের মনের আবেগকে পুষ্ট করে। ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে খাবার আমরা প্রিয়জনকে উপহার দিই। বিশেষ স্বাদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ স্মৃতি আমাদের আনন্দ দেয়। আবার খাদ্যকে আমরা শত্রু হিসেবে ভাবতে পারি যা কিনা আমাদের ওজন বাড়িয়ে দেবে। ফলে খাদ্য আমাদের মনের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে।

এক সময়ে বাজারে গেলে আমরা কি ধরনের তরিতরকারি বা শাক সব্জি পাবো, তা নির্ভর করতো বছরের কোন সময়ে বাজার করছি তার ওপর – গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে না শীতকালে? শীতকালে বাজারে সব্জির সমারোহ – ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গাজর, ইত্যাদি অনেক কিছু। গ্রীষ্মকালে উচ্ছে, পটল এইসব খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। শীতকালে আপেল, কমলালেবু, নাসপাতি, বাতাবি লেবুতে বাজার ছেয়ে যেত। গ্রীষ্মকালের গরমে আম, জাম, লিচু খেতাম। এখন সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দূর দূর অঞ্চল, এমনকি অনেক সময়ে দেশের বাইরে থেকেও খাবারদাবার আসে। তাই সবকিছুই সব সময়ে পাওয়া যায়। যদিও অসময়ের জিনিস কিনতে দাম দিতে হয় অনেক বেশি।

এই সঙ্গে বাজারে আরেকটি পরিবর্তনও ঘটেছে শাকসব্জি ও ফলের সাইজে। এখনকার বেগুন বা কপির সাইজ আগেকার বেগুন বা কপির থেকে বড়। কারণ এখন চাষে নানা কৃত্রিম পদ্ধতি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) ব্যবহার করা হচ্ছে। এখনকার শাক–সব্জিতে পোকামাকড়ও কম কারণ এতে বহু কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এক দিক থেকে এ সব বাঞ্ছনীয় মনে হলেও এর কুফল যথেষ্ট। প্রথমত সব্জি যদি খুব ভালভাবে না ধুয়ে খাওয়া হয়, তাহলে এর গায়ে লেগে থাকা কীটনাশক ওষুধগুলি পেটে গিয়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে বড় করা সব্জি বা ফল খেলে শরীরের উপর কি প্রভাব পড়বে তা এখনও আমরা জানি না।

আজকাল যে সমস্ত নাম করা মুদির (গ্রোসারী) দোকান হয়েছে, সেখানে টাটকা জৈবিক উপায়ে তৈরী খাবার পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র কাঁচা শাকসব্জি ও ফলমূলের ছোট দোকান, যা সাধারণত বাইরে বসে, সেখানে হয়তো এমন কিছু ফল ও সব্জি পাওয়া যেতে পারে যা কোন প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় নি। তবে সেখানেও দেখা যাবে যে আপনার পছন্দের আপেলটি হয়তো কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনার পাড়ার দোকানে এসে পৌঁছেছে। আবার খোঁজ নিলে জানতে পারবেন খাওয়ার জন্যে যে আটা বা ময়দা কিনছেন, তা হয়তো সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়নি। কিন্তু প্যাকেটের গায়ে সেসব লেখা থাকে না বলে আপনি নিরুপায়। যে শস্য বা সব্জি কিনছেন তাতে হয়তো উৎপাদন কালে ছড়ানো কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থেকে গিয়েছে যা আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে। খাবারে কীটনাশক আছে কিনা সেই পরীক্ষা হয় না বললেই চলে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েও দেখা হয় না। তাই আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যা খাচ্ছেন তা কতখানি সুরক্ষিত সে বিষয়ে আপনি হয়তো কিছুই জানতে পারছেন না। এই না জানার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকরণ করা খাদ্যের ঝুড়ি ঝুড়ি বিজ্ঞাপন, স্বাস্থ্যকর খাদ্য সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্য, এবং ওজন কমিয়ে 'সুশ্রী' থাকার জন্যে সর্বক্ষণের মানসিক চাপ। ফলে নানান রকম ধারনার মধ্যে কোনটা ঠিক, তা ভালমত বোঝা যায় না।

সাধারণত খাদ্যশস্য কৃষকের কাছ থেকে ব্যবসায়ীর কাছে যায়, সেখান থেকে পৌঁছয় প্রক্রিয়াকারকের কাছে। প্রক্রিয়াকরণের পর পাইকারী বিক্রেতার হাত ঘুরে খুচরো বিক্রেতার মাধ্যমে তা পৌঁছায় আপনার পাতে। এই বহুবিধ চালাচালির ফলে খাদ্য উৎপাদন বিষয়টি থেকে আমাদের মানসিক এবং শারীরিক দূরত্ব বেশ অনেকটা। তাই চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো ধারণা আমাদের নেই বললেও চলে। আজকের দিনে চাষের কাজে বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ছোট ছোট চাষী পরিবারের জায়গায় উৎপাদনে ঢুকছে বড়ো বড়ো কোম্পানীর মালিকানাধীন কৃষি খামার। বড়ো বড়ো কোম্পানী এলে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমির কর্মীরা হন শোষণের শিকার। আর এই কর্মকাণ্ডের আশেপাশে যে সমস্ত মানুষ বাস করেন, তাদের স্বাস্থ্যও বিপন্ন হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্বচ্ছ ও সীমিত।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাড়-বাড়ন্তের ফলে অনেক খাদ্যদ্রব্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) মত কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আরোপিত শর্তের ফলে আমদানী করা খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন গুণমানের হয়, কারণ অনেক সময় নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বিধি মানা হয় না। এই সমস্ত পরীক্ষার নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে দূষিত খাদ্য চিহ্নিত

করে তা বর্জন করার জন্যে। কিন্তু এই পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়ার ফলে আমদানী করা খাদ্যে কীটনাশক উপস্থিতির নিষেধ বিধি, মাংস ও মুর্গী উৎপাদনের জন্যে পশুপালনে ব্যবহৃত হর্মোনের পরিমাপ সংক্রান্ত নিয়ম, এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক জিনিষের হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখার নিয়মাবলী কাজে লাগানো হচ্ছে না।

সুষম আহার

শরীর বৃদ্ধি অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন কোষের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, এবং কার্যক্ষমতার জন্য প্রয়োজন শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ বা ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় উপাদান। এবং অবশ্যই তার সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জল। সুস্থ সবল শরীর একটা পাকা বাড়ির মত। পাকা বাড়ি বানাতে পরিমাণ মত ইট, বালি, সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদির প্রয়োজন। একটাও উপকরণ বাদ পড়লে পোক্ত বাড়ি বানানো যায় না। শরীরের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। পরিমাণ মত শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ইত্যাদি না পেলে শরীরের পূর্ণ বৃদ্ধি হয় না। সঠিক পরিমাণে এই উপাদানগুলি যে খাবারে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

ঠিক না ভুল?

৩২ খাদ্য থেকে সমস্ত ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ বাদ দিলে আমি সুস্থ থাকব।

ভুল। ফ্যাটের ব্যাপারে আমাদের দেশে কেউ কেউ মাথা ঘামান কারণ এতে মেদ বৃদ্ধি হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমাদের পুষ্টির পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদন। শরীরে ভিটামিন সংগ্রহ, স্নায়ুর সুস্থতা, হর্মোনের সমতা, আর পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ দরকার। কিন্তু ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড নামে এক ধরণের স্নেহ পদার্থ শরীরের পক্ষে ভাল নয়। কোন খাবারে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি খাবারের প্যাকেটে লেখা উপাদানগুলি দেখে। যদি তেল বা অন্য খাদ্যের উপাদানের তালিকায় হাইড্রোজেনেটেড বা স্বল্প হাইড্রোজেনেটেড স্নেহ জাতীয় পদার্থ রয়েছে লেখা থাকে তাহলে জানবেন সেটিতে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আছে।

সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানলেও অনেক সময় সেই খাদ্য কিনে খাওয়ার সামর্থ্য আমাদের থাকে না। অথবা পুষ্টিকর খাদ্য হয়তো খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। সীমিত আয়ের পরিবারে অনেকে ভাবেন সুষম খাদ্য প্রতিদিন খাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। ফলে তাঁরা তা বাদ দিয়ে পেট ভরানোর জন্যে অল্প পুষ্টির

খাবার খান এবং সকলকে পরিবেশন করেন। এছাড়া যে সমস্ত পরিবারে মা এবং বাবা দুজনকেই দিনের অনেকটা সময় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাঁদের পক্ষে কম দামে পুষ্টিকর খাদ্যের খোঁজ করা বিষম বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার খেতে যে অনেক অর্থের প্রয়োজন তা ঠিক নয়। আদর্শ সুষম খাবারে শাকসব্জি ও ফল যেমন থাকবে, সেরকম মাছ, মাংস, বা ডিম থাকবে, এবং থাকবে ভাত বা স্টার্চ জাতীয় খাবার।

পৃথিবী ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বাড়ছে মানুষের কর্মব্যস্ততা। জীবিকা–নির্বাহের জন্য আরও বেশি সময় দিতে হচ্ছে সকলকেই। বাজার করা, রান্না করা, এমনকি খাওয়ার জন্য সময় কমে যাচ্ছে দিনকে দিন। আমরা অনেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পথ চলতে চলতে, খেয়ে নিচ্ছি বাইরে তৈরী করা খাবার, চট–জলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী করা খাবার। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার প্রভাব পড়ছে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডায়াবেটিস (বহুমূত্র রোগ) রোগী রয়েছে সে রকম দশটি দেশের মধ্যে ভারতই শীর্ষস্থানীয়। ১৯৮৩ সালে ভারতের জনসংখ্যার ৫.২ শতাংশ লোক ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন, ১৯৮৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৮.২ শতাংশ, এবং ১৯৯৫ সালে ১১.৬ শতাংশ। ২০০০ সালে আমাদের দেশে তিন কোটি সতেরো লক্ষের বেশি লোক ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের জনপ্রিয়তা আর শারীরিক পরিশ্রম না করা। এছাড়া আমরা হয়তো পরিমাণে বেশি খাচ্ছি কিন্তু সে খাবারের গুণগত মান এতই কম যে সেগুলি আমাদের শরীরে প্রয়োজন মত পুষ্টি যোগাচ্ছে না। এ ছাড়া আয়ের অঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ বিত্ত সমাজে মানুষ শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে। ফলে স্থূলাঙ্গতা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিসও।

শরীর সুরক্ষিত রাখার জন্যে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন সময়, শক্তি, সঙ্গতি এবং সে বিষয়ে জ্ঞান। তবেই আমরা সঠিক খাদ্য বেছে নিতে পারবো।

হাসি বক্সী

আমার বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। শরীর ভালো রাখার জন্যে আমি বেশ সাবধানেই খাওয়া দাওয়া করি। প্রচুর সব্জী খাই কিন্তু শাক বা কপি জাতীয় সব্জী আমার খাদ্য তলিকায় কম রাখি। ভাজাভুজি একদম না। ফল খেতে ভালো লাগে আর গোটা ফল খেলে শরীরও ভালো থাকে। তাই ফলের রসের বদলে আঁশযুক্ত ফল খাই। আজকাল দুধ হজম করতে পারি না, তাই খাই না। তবে খাবারে প্রোটিন যাতে বেশি থাকে সেদিকে সজাগ থাকি।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকা কি রকম হওয়া উচিত?

আজকের দিনে স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। যদিও ব্যক্তি বিশেষের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করবে তার স্বাস্থ্য, বিপাকীয়তা, এবং জন্মসূত্রে পাওয়া শারীরিক গড়নের ওপর, তবুও কোনটি পুষ্টিকর খাদ্য এবং কোনটি পুষ্টিকর নয় তা বোঝার জন্য কতকগুলি মৌলিক সূচক আছে।

১) পূর্ণাঙ্গ খাবার খান। শস্য বা প্রাণীজ যে সমস্ত খাবারের প্রাকৃতিক রূপ প্রায় অবিকৃত রয়ে গিয়েছে তাই হল পূর্ণাঙ্গ খাবার। এই খাবারের কোনও প্রক্রিয়াকরণ বা শুদ্ধিকরণ না হওয়ার দরুণ এগুলির পুষ্টিগুণ কারখানায় তৈরী খাবারের চেয়ে অনেক বেশি। এর উদাহরণ হল তাজা আর কারখানায় তৈরী ফলের রসের পার্থক্য। তাজা ফলে শরীরের উপযোগী যে আঁশ আছে তা কারখানায় তৈরী ফলের রসে থাকে না। দুধের সরে যত ক্যালসিয়াম আছে তা পনিরে নেই।

পূর্ণাঙ্গ এবং প্রক্রিয়াকরণের পর খাদ্যের তফাতের আর একটি দৃষ্টান্ত হল মোটা লাল আটা আর সাদা ধবধবে ময়দার মধ্যে পার্থক্য। পাঁউরুটি জাতীয় খাদ্য তৈরী করার জন্যে যে ময়দা লাগে তা তৈরী হয় অনেকগুলি ধাপে গম পরিস্রুত করে। পরিস্রুত করতে প্রথমে গমের খোসা ভুষি করে আলাদা করে নেওয়া হয় যার ফলে আঁশ, ভিটামিন-বি, এবং আরও কিছু পুষ্টিকর খাদ্যগুণ বাদ চলে যায়। তারপরে গমের অবশিষ্টাংশ যার পুষ্টিগুণ প্রায় নেই বললেই চলে, তা মেশিনে গুঁড়ো করে ময়দা তৈরী করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যগুণ আরও কমে যায়। মানুষের শরীরে এই বাদ পড়ে যাওয়া পুষ্টিগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। এগুলি খাবার হজম করতে এবং শরীরকে ভিটামিন ও অন্যান্য খনিজগুণ শোষণ করতে সাহায্য করে। খাদ্যের মধ্যে এগুলি না পেলে তা যোগায় আমাদের শরীরের মধ্যে আগে থেকে সঞ্চিত পুষ্টির ভাণ্ডার।

আমাদের অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগের কারণ শরীরে কয়েকটি ভিটামিন বি-র অপ্রতুলতা। তাই পাশ্চাত্যে ময়দা প্রস্তুতকারীরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী কিছু পুষ্টি, যেমন থায়ামিন (ভিটামিন বি-১), রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন বি-২), এবং ফলিক অ্যাসিড ময়দার মধ্যে যোগ করে দেন। কিন্তু আমাদের দেশে পরিস্রুত খাবারে এই উপাদানগুলি বাদই থেকে যায়। দিনের পর দিন অপুষ্টির ফলে আমাদের শরীরের মধ্যে সঞ্চিত ভাণ্ডারগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ খাবারের একটি জরুরী উপাদান হল পটাসিয়াম নামে একটি খনিজ লবণ যা আরেকটি খনিজ, সোডিয়ামের সঙ্গে মিলে আমাদের শরীরের কোষের মধ্যে থাকা জলীয় পদার্থের সাযুজ্য বজায় রাখে। এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালানোর জন্যে আমাদের শরীরে সোডিয়ামের চাইতে দুই থেকে ছয়গুণ বেশি পটাসিয়াম থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এই অনুপাত নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সব তাজা ফল ও শাকসব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে। প্রায় সমস্ত পূর্ণাঙ্গ খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে

পটাসিয়াম আছে বলে আমাদের শরীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তা সংগ্রহ করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ খাবারে সোডিয়াম নেই বললেই চলে। প্রক্রিয়াকরণের ফলে খাবারে সোডিয়াম বেড়ে যায় ও পটাসিয়াম কমে যায়। তাই প্রক্রিয়াকরণ করা বা পরিস্রুত খাবার বেশি খেলে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সঠিক অনুপাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২) বেশি করে ফল ও সব্জি খান। ফল ও সব্জিতে জারণ-বিরোধী (অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট) উপাদানের পরিমাণ বেশি। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বলে একটা পুষ্টি আছে যা আমাদের শরীরে বিষাক্ত রস বা টক্সিনগুলি নষ্ট করতে সাহায্য করে। সাধারণত রঙীন ফল ও সব্জিগুলিতে জারণ বিরোধী উপাদান বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ হলুদ, কমলা, ও গাঢ়-সবুজ রঙের সব্জি, বিভিন্ন রকমের লেবু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জারণ-বিরোধী উপাদানগুলি খাদ্যের পরিপূরক হিসেবেও খাওয়া যায় কিন্তু খাবারের মধ্যে থাকলে এর শক্তি অনেক বেশি হয়।

ফল ও সব্জিতে আরও অনেক ভিটামিন ও খনিজের উপস্থিতির হার যথেষ্ট। যেমন জাম, কমলা, মুসাম্বি, ও ক্যাপসিকামে প্রচুর ভিটামিন-সি আছে যা আমাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। গাজর ও রাঙা-আলু বেটা-ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে উপকারী। সবুজ পাতাওয়ালা সব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ও ভিটামিন-কে আছে যা আমাদের দাঁত ও হাড় মজবুত করে।

ফল ও সব্জি আমাদের রোগের হাত থেকে সুরক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের প্রাত্যাহিক প্রক্রিয়াগুলিকেও ভালভাবে চলতে সাহায্য করে। ফল, সব্জি ও দানা-শস্যের আঁশ খাবার হজম করতে ও তা শরীরের ভিতরের অন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সাহায্য করে। খাবার খাওয়া এবং পরে সেটি মলদ্বার দিয়ে বিষ্ঠা হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়কে 'বাওয়েল ট্রান্সিট টাইম' বলে। এই সময় নির্দিষ্টভাবে কতক্ষণ হওয়া উচিত তা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও সাধারণত আঠারো থেকে তিরিশ ঘন্টা হল নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত সময়। এই চলাচলের সময় খুব কম হলে আমাদের শরীর খাবারের থেকে যথেষ্ট পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না। আবার এই সময় খুব বেশি হলে জৈবিক পাচন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ ও ব্যবহৃত হর্মোন, যা বর্জন হওয়া দরকার, সেগুলি শরীর আবার শুষে নেয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন গাঁটে এবং পেশীতে ব্যথা এবং শরীরে হর্মোনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। দিনে এক থেকে তিনবার মলত্যাগ করা স্বাভাবিক। কিন্তু দিনে অন্তত একবার পায়খানা না হলে উপরে

উল্লেখিত আঁশযুক্ত খাবার বেশি করে খান। তবে দিনে তিনবারের বেশি পায়খানা হলে ধরে নিতে হবে তা অস্বাভাবিক এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ
রোজ দুই থেকে চার টুকরো তাজা ফল খান। দিনে বা রাতে যা খান তার অর্ধেক যেন সব্জি হয়।

সুষম খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তার পরিমাপের ছবি নীচে দেওয়া হল।

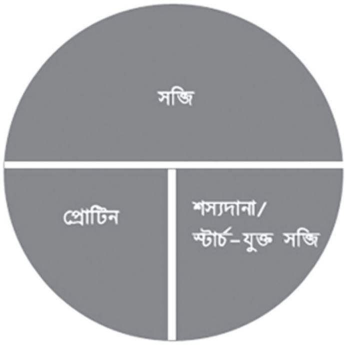

৩) যে পরিমাণ এবং ধরণের পূর্ণাঙ্গ খাবার আপনাকে সতেজ রাখে তাই খান
স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আপনার যদি বেশি প্রোটিন যুক্ত খাবার এবং তার সঙ্গে প্রচুর শ্বেতসারহীন সব্জি ও কম কার্বোহাইড্রেট খেতে ভালো লাগে, তাহলে তাই আপনার পক্ষে সঠিক খাদ্য হতে পারে। আবার আপনি যদি যথেষ্ট শস্য, সব্জি এবং বীন জাতীয় খাবার খেয়ে সুস্থ থাকেন, তাহলে তাই আপনার পক্ষে ঠিক খাদ্য।

৪) সম্ভব হলে জৈব উপায়ে তৈরী (অর্গানিক) স্থানীয় ঋতুকালীন খাবার খান
আপনার এলাকায় কি জৈব খাবার সহজলভ্য এবং তার দাম কত তা নির্ভর করবে আপনি কোথায় থাকেন। সকলের পক্ষে এ ধরণের খাওয়া জোগাড় করা খুব সহজ নয়। কিন্তু যদি জৈব পদ্ধতিতে তৈরী খাবার পাওয়া যায় তাহলে সেগুলিই সবচাইতে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য। যাঁরা জৈব পদ্ধতিতে চাষ করেন তাঁরা জমির স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শস্যের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে জৈব সার ব্যবহার করেন, ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করেন না। ফলে উৎপাদিত ফল ও সব্জির পুষ্টিগুণ বেশি হয়। স্থানীয় চাষীর কাছ থেকে ঋতুকালীন ফল ও সব্জি কেনা সব সময়েই শ্রেয়। এর অনেক সুবিধে আছে। আপনি যে পয়সা

খরচ করছেন তা স্থানীয় কৃষক পাচ্ছে এবং স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হচ্ছে। তাছাড়া যেহেতু আপনি জানেন যা খাচ্ছেন তা কোথায় উৎপাদিত হচ্ছে এবং কিভাবে তার চাষ হচ্ছে, আপনি নিশ্চিত থাকছেন যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত খাবার খাচ্ছেন। আবার স্থানীয় চাষীরা যেহেতু ঠিক সময়ে ফল, সব্জি ও শস্য ঘরে তোলেন তা শুধু পুষ্টিকর হয় না, খেতেও হয় সুস্বাদু।

ঘাস এবং অন্যান্য জৈব খাবার খাওয়া প্রাণী সাধারণত অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে সমস্ত শিশুরা জৈব খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠে তাদের শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি প্রথাগত খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের তুলনায় অনেক কম।

আমাদের দেশে আগে চাষীরা জৈব প্রথায় ফলমূল, শস্য, সব্জি উৎপাদন করতেন। এখন বেশি উৎপাদনের তাগিদে ধীরে ধীরে সেই নিয়ম থেকে তাঁরা সরে আসছেন। যদি আপনার সব জৈব খাবার কিনতে আর্থিক সমস্যা থাকে তাহলে জৈব উপায়ে তৈরী সহজলভ্য মাংস, ডিম, দুধ আর স্নেহজাতীয় খাবার খান। এগুলিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ রয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তাই সাধারণ পদ্ধতিতে তৈরী হলে বিষাক্ত কীটনাশক শরীরে যেতে পারে।

অধিকাংশ কীটনাশক তৈরী হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। পেট্রোলিয়াম এক ধরণের তেল যা সহজেই স্নেহজাতীয় পদার্থে মিশে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে আপেল, আঙুর, নাসপাতি, আলু ইত্যাদি ফল ও সব্জিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি বেশি কিন্তু কলা, ফুলকপি, আম, পেঁয়াজ, পেঁপে এবং আনারসে তুলনামূলকভাবে কম।

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গ্রহণের পরিমাণ

প্রোটিন – ৫০ গ্রাম (কেরলের পরে এটাই ভারতে সর্বনিম্ন পরিমাণ)
রিবোফ্ল্যাবিন – ০.৭ মিলিগ্রাম
বেটা-ক্যারোটিন – ১৪৭২ মাইক্রো-গ্রাম
অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড – ৬১ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-ই – ১১.০ মিলিগ্রাম

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

উপরের সংখ্যাগুলি গড়, দরিদ্র লোকেদের ক্ষেত্রে এই পরিমানের সংখ্যা আরও কম। তার মূল কারণ যথেষ্ট পরিমাণ ফল, শাক-সব্জি, এবং দুধ না খেতে পাওয়া। নিম্ন-আয়ের মানুষের খাবারে ভিটামিন-ই এবং অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড-এর পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও, রিবোফ্ল্যাবিন-এর পরিমাণ কম। বেটা-ক্যারোটিনের মাত্রা কেবলমাত্র উচ্চ-বিত্ত লোকেদের মধ্যেই সন্তোষজনক।

বিত্তবান ঘরের শিশু ছাড়া অধিকাংশ নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা ভিটামিন-সি ও বেটা-ক্যারোটিন-এর স্বল্পতায় ভোগে। এর প্রধান কারণ তারা যথেষ্ট ফল এবং শাকসব্জি খাবার সুযোগ পায় না। দৈনিক যতটা পুষ্টির প্রয়োজন, একমাত্র

উচ্চ–বিত্ত ছাড়া ভারতবর্ষে সাধারণভাবে ততটা পুষ্টি কেউই পায় না। বিশেষ করে বেটা–ক্যারোটিন–এর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় শরীরে খুবই অল্প থাকে।

মাছ খাওয়া নিয়ে দু একটি কথা

মাছ এবং খোসা সমেত প্রাণী (যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, গুগলি) সুষ্ঠু খাদ্যতালিকায় থাকা দরকার। এ সবে প্রচুর প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর স্নেহজাতীয় পদার্থ রয়েছে। প্রয়োজনীয় ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড একমাত্র মাছ থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের শরীর ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড নিজের থেকে তৈরী করতে পারে না। মাছ খাওয়া খুবই ভাল, কিন্তু কিছু কিছু মাছে প্রচুর পরিমানে পারদ এবং অন্যান্য বিষাক্ত খনিজ পদার্থ ঢুকে থাকে। ভেড়ির জলে যত পারদ বাড়ে মাছে ততই তা বৃদ্ধি হয়। তেলাপিয়া মাছে (আমেরিকান কই) পারদ বেশি পরিমানে পাওয়া যায়। কম বয়সী ও সন্তানসম্ভবা মহিলা এবং শিশুদের এই ধরণের মাছ না খাওয়া উচিত। মায়েদের শরীরে পারদ থাকলে তা বুকের দুধের সঙ্গে শিশুর শরীরেও চলে যেতে পারে।

আমাদের শরীরের পুষ্টি যোগানোর উপাদান

খাদ্যের কোন উপাদানকে আমাদের শরীর কিভাবে কাজে লাগায় তা বোঝার জন্যে উপাদানগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সকলের প্রয়োজন। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ – এই তিনটি উপাদান আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমানে প্রয়োজন।

প্রোটিন

প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড নামক অণুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। প্রোটিন আমাদের শরীরে মাংসপেশী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চামড়া, নখ, এবং চুল ইত্যাদি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রোটিন আমাদের শরীরে কিছু জৈব–রাসায়নিক যেমন এনজাইম ও হর্মোন তৈরীতে সাহায্য করে। এই জৈব–রাসায়নিক আমাদের শরীরের বৃদ্ধি, রোগ নিরাময়, হজম, এবং বিষাক্ত রাসায়নিক রসকে নির্জীব করে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের শরীরে ২৩ (সংখ্যাটি সম্পর্কে মতান্তর আছে) রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এর মধ্যে ৯টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাণীজ খাদ্য যেমন ডিম, দুগ্ধজাত খাবার, এবং মাংস থেকে পাওয়া প্রোটিনে এই ৯ ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিডই থাকে। কিন্তু কোন কোন শাকসব্জি যেমন বরবটি ও বীন, বাদাম, ও শস্য জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড নেই। তবে সারাদিন বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনযুক্ত শাকসব্জি খেলে আমাদের শরীরে এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর চাহিদা মিটে যায়।

শরীরে প্রোটিনের চাহিদা ব্যক্তি বিশেষের বয়স, কাজকর্ম, বংশ পরম্পরা, ও রোগ, এই সবের ওপরই নির্ভর করে। সেই চাহিদা খাদ্যের মাধ্যমে না মিটলে প্রোটিন অভাবজনীত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে দুর্বলতা, মাংসপেশীর জোর কমে যাওয়া, ক্লান্তি, চুল এবং নখ শুকিয়ে ভেঙে যাওয়া, ক্ষত শুকোতে দেরী হওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, রক্তে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, এমনকি মানসিক অবসাদও দেখা দিতে পারে।

কার্বোহাইড্রেট

কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরের কোষগুলিতে শক্তি সঞ্চারের প্রধান উৎস। কোন কোন কার্বোহাইড্রেটের ধরণ সরল হয়, যেমন চিনিতে যা থাকে। আবার কোনটির হয় জটিল যা কিনা সব্জি ও শস্যে থাকে। তবে এই জটিল কার্বোহাইড্রেটও সহজে ভেঙে গিয়ে সরল আকার ধারণ করে গ্লুকোজ বা শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং তা আমাদের শরীরের কোষগুলিতে শক্তি সঞ্চার করে। সম্পূর্ণ কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্য যেমন ফল, সব্জি, আর আস্ত শস্যদানায় যথেষ্ট পরিমানে আঁশ থাকে। কিন্তু ময়দার তৈরী খাবার যেমন বিস্কুট ইত্যাদিতে যে কার্বোহাইড্রেট থাকে তাতে আঁশ থাকে না। এগুলি তাৎক্ষণিক শক্তি যোগালেও শরীরের পক্ষে ভাল নয়। তবে প্রক্রিয়াকরণ করা কার্বোহাইড্রেট যেমন চিনি বা আঠাল (গ্লুটেন যুক্ত) খাবার ইত্যাদি রক্তে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে যকৃৎ থেকে ইনসুলিন নামক হর্মোনের অধিক ক্ষরণ হয়। এই ইনসুলিন রক্তের শর্করার সঙ্গে শরীরের কোষগুলিতে পৌঁছায়। এর আধিক্যের ফলে এক থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার রক্তে শর্করার পরিমাণ কম হলেও ক্লান্তি, মনঃসংযোগে অসুবিধে, দুশ্চিন্তা, মাথা ধরা, মানসিক অবসাদ, অশক্ত ভাব, ও খিটখিটে হয় যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে যত শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করে তা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত না হলে শরীরে মেদ হিসেবে সঞ্চিত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে যথাযথ ভাবে চলার জন্যে আমাদের শরীর আরও শর্করা চায়। ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে আমরা আরও কার্বোহাইড্রেট খাই। প্রয়োজনের বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে তা মেদে পরিণত হয়ে আমাদের শরীরে জমে থাকে। এই চক্রটি চলার

কারণে শরীর ইনসুলিন প্রতিরোধ করতে থাকে এবং শরীরের কোষগুলি ইনসুলিন কাজে লাগাতে পারে না। ফলে আমাদের ওজন বেড়ে যায় আর যা খাই তা থেকে শরীর পুষ্টি নিতে পারে না। শরীরে মেদ বেড়ে গেলে আরও বেশি করে ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরী হয় যা ডায়াবেটিস রোগের সূচনার লক্ষণ। শরীরের এই অবস্থার সঙ্গে হৃদরোগ এবং রক্তচাপ জনিত সমস্যাও আরম্ভ হতে পারে।

সায়ন্তনীর কথা

অন্যান্য বাঙালী বাড়ির মত আমি রুটি, লুচি, বিস্কুট খেয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু আমার প্রথম সন্তান জন্মাবার পর এক সময়ে আমার পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়। কোন ডাক্তারই কিছু ধরতে পারছিল না। আমার কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছিল, শরীর ভেঙ্গে যেতে থাকল। অ্যালার্জি আছে বলে আমি দুগ্ধ জাতীয় খাবার খেতে পারতাম না। তারপর দেখলাম আঠাল (গ্লুটেন যুক্ত) খাবার খেলে আমার পেটব্যথা বাড়ে। খুব সতর্ক হয়ে গম থেকে তৈরী সব খাবার ছেড়ে দিলাম। আশ্চর্য! খুব অল্প সময়ের মধ্যে পেটের ব্যথা সেরে গেল। এখন আমি সবই খাই কেবল দুগ্ধ জাতীয় আর গম থেকে তৈরী খাবার ছাড়া। পেটে কোন অসুবিধেই আর নেই।

স্নেহজাতীয় পদার্থ বা ফ্যাট

গত তিন দশক ধরে স্নেহজাতীয় পদার্থ বিরোধী প্রচার চলছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলি আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন করে। স্নেহজাতীয় পদার্থ খেলে পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি হয়। এছাড়া স্নেহজাতীয় পদার্থ যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন স্নেহজাতীয় পদার্থের মাধ্যমে শরীর বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন গ্রহণ করতে পারে। যেমন ত্বক এবং দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্যের জন্যে ভিটামিন–এ, হাড় এবং রক্তের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভিটামিন–ডি ও কে, বিষাক্ত রাসায়নিকগুলিকে অসাড় করার জন্যে ভিটামিন–ই। সুষম খাদ্য থেকে যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমরা পাই তা আমাদের শরীরে স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, হর্মোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে।

সম্পৃক্ততার তারতম্যে প্রাকৃতিক স্নেহজ পদার্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম গোষ্ঠীর স্নেহ পদার্থের অণুগুলি সম্পৃক্ত বা রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণ (স্যাচুরেটেড)। অর্থাৎ সেখানে সবকটি কার্বন পরমাণু অপর একটি কার্বন বা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একযোজী বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর

স্নেহজাতীয় পদার্থে অণুর গঠনে একটি মাত্র দ্বিযোজী বন্ধনী থাকে যেখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হতে পারে (মনো–আনস্যাচুরেটেড), যেমন জলপাইয়ের (অলিভ) তেল এবং ক্যানোলা তেল। তৃতীয় গোষ্ঠীর অণুতে অনেকগুলি দ্বিযোজী বন্ধনী থাকে (পলি–আনস্যাচুরেটেড), যেমন ভুট্টা, সূর্যমুখি, এবং সয়াবীন থেকে তৈরী তেল।

আর এক ধরণের অস্বাস্থ্যকর স্নেহ পদার্থ হল ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন যুক্ত স্নেহ পদার্থ। বেশিদিন ভাল রাখার জন্যে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় জমাট বাঁধানোর জন্যে এগুলির রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে হাইড্রোজেন অণু কৃত্রিম উপায়ে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে অণুগুলি এমন এক গঠন নেয় যে সেগুলিকে আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে চলাচল করে এবং আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলির মতই এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের কোষের প্রাচীরে লেগে গিয়ে কোষগুলিকে অনড় এবং দুর্বল করে দিতে পারে।

বাজারে যে সমস্ত ভাজা এবং প্রক্রিয়াকৃত খাবার পাওয়া যায় সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। খাবারের প্যাকেটের গায়ে উপাদানগুলির যে নাম লেখা থাকে তাতে যদি হাইড্রোজেন যুক্ত বা আংশিক হাইড্রোজেন যুক্ত কথাগুলো লেখা থাকে তাহলে তাতে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে জানবেন এবং তা না খাওয়াই ভাল।

সাধারণত সুষম খাদ্য নির্দেশিকাতে সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ কম খাওয়ার কথা লেখা থাকে কারণ এগুলি রক্তে কোলেস্টেরল বা গাঢ় স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যে সমস্ত সমীক্ষা সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থের সঙ্গে হৃদরোগের যোগসূত্র পেয়েছে তাতে এ ধরণের স্নেহ পদার্থ এবং ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা আলাদা করে উল্লেখ নেই। কিন্তু এ দুটি পদার্থই যে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন কোন খাদ্য থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

নিশ্চিন্তে ডিম খেতে পারেন

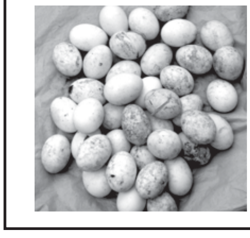

এক সময়ে ডিমকে আদর্শ প্রোটিনের উৎস হিসেবে ধরা হত। কিন্তু গত তিন দশক ধরে ডিম খেলে হৃদরোগ হতে পারে এই ভ্রান্ত ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে অনেকে শুধু ডিমের সাদা অংশ বা এর বিকল্প খেয়ে থাকেন। তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরা সপ্তাহে সাতটি পর্যন্ত গোটা ডিম খেতে পারেন।

ডিমের গুণাগুণ

- ডিম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং আমাদের শরীরে পরিশ্রম করার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ক্যালরি যোগায়।
- ডিমের কুসুম আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি–এর অন্যতম উৎস।
- ডিমের কুসুমে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ, রিবোফ্লাবিন, ফসফরাস, ফলিক অ্যাসিড, সেলেনিয়াম, ও ক্যালসিয়াম থাকে। এ ছাড়া থাকে দস্তা, লোহা বা আয়রণ জাতীয় খনিজ লবণ, ভিটামিন বি–৬, ভিটামিন বি–১২, এবং ভিটামিন–ই।
- পোলট্রি ফার্মের মুরগির তুলনায় গৃহপালিত মুরগি অনেক বেশি জৈব খাবার খায়। এ সব খাবারে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, ফলে ঐ মুরগির ডিমের কুসুমে হৃৎপিণ্ডের (হার্ট) স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।
- ডিমের কুসুমে কোলিন থাকে যা গর্ভের শিশুর মগজ বা বুদ্ধি তৈরীর প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।
- দরিদ্র পরিবারে নারী ও শিশুদের মধ্যে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের অভাব দেখা যায়। ফলে তাদের রাতকানা হওয়ার, মুখে ঘা হওয়ার ও রক্তাল্পতায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি। সপ্তাহে দুটো বা তিনটে ডিম খেতে পারলে এ সব রোগ থেকে অনেকটা মুক্ত হওয়া যায়।

একটা মাঝারি মাপের ডিমে (৫০ গ্রাম ওজনের) কী কী পুষ্টি থাকে ও তার পরিমাণ

ক্যালোরি (শক্তি) – ৭৭০
প্রোটিন – ৬.১ গ্রাম
শর্করা – ০.৩ গ্রাম
স্নেহ পদার্থ – ৫.৫ গ্রাম

ভিটামিন বি–কম্পলেক্স:
  থায়ামিন – ৪০ মাইক্রোগ্রাম
  রিবোফ্লাবিন – ১৩০ মাইক্রোগ্রাম
  নিকোটিনিক অ্যাসিড – ১.৬ মাইক্রোগ্রাম

ভিটামিন–এ – ৫৫০ ই.ইউ

খনিজ লবণ:
  ক্যালসিয়াম –২৬ মিলিগ্রাম

লোহা বা আয়রণ – ১.১০ মিলিগ্রাম
ফসফরাস – ১০১ মিলিগ্রাম

(সূত্রঃ জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা কষ্টকর। আমরা কেউ কেউ খুব দ্রুত খাদ্যাভ্যাস আমূল বদলে ফেলতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষকেই ধাপে ধাপে খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হয়। খাদ্যাভ্যাস পাল্টালেও ঐ পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যাভ্যাস বদলে স্বাস্থ্য সম্মত করার জন্যে কিছু পরামর্শ

১) স্বাস্থ্য সম্মত খাবার খেতে পছন্দ না হলে একটু ওলট পালট করে নিজের মত করে তৈরী করে নিন। এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই পারেন।

২) প্রাতরাশ বাদ দেবেন না। সকালে যথেষ্ট পরিমাণ জলখাবার খেলে বেলার দিকে মিষ্টি বা চা–কফি জাতীয় উদ্দীপক পানীয়ের চাহিদা কম হবে। ভুষি বাদ না দেওয়া আটার রুটি, গৃহপালিত মুরগির ডিম, সবুজ সব্জি, টাটকা ফল, দই বা বাদাম জাতীয় খাবার খান। একটু বেশি করে রান্না করে রাখলে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না কিন্তু ভাল করে প্রাতরাশ সারতে পারবেন।

৩) টিফিন এবং টুকটাক খাওয়ার ধরণ পাল্টাতে হবে। আমাদের অনেকেরই একটু বেলার দিকে খিদে পেয়ে যায়। ফলে আমরা হাতের কাছে যা পাই চিন্তা না করেই খেয়ে ফেলি, যেমন চা–কফি–বিস্কুট, ডালমুট, সোডা জাতীয় পানীয়। কিন্তু এগুলির কোনটাই সারাদিনের মত পুষ্টি যোগায় না। একটু ভেবে পুষ্টিকর অথচ সহজলভ্য খাবার আগে থেকে যোগাড় করে রাখুন। যেমন ভুষি বাদ না দেওয়া আটার রুটি, শাক, গাজর, ফল, দই ইত্যাদি।

৪) দুপুর ও রাতে পরিকল্পিত খাবার খান। একটি সব্জি, একটি প্রোটিন যুক্ত খাবার, ভাত বা রুটি, ডাল ও দুগ্ধ জাতীয় খাবার খান।

৫) মোটামুটি ভাবে এসব খাবারে অভ্যেস হলে ভাঁড়ারে ভুষি বাদ না দেওয়া আটা, মোটা চাল, ডাল, শুকনো ফল, বাদাম, তাজা সব্জি ও ফল, জৈব উপায়ে তৈরী দুগ্ধজাতীয় খাবার ও ডিম রেখে দিন। খেতে সুবিধে হবে। এগুলি সবই পুষ্টিকর খাবার।

৬) পূর্ণাঙ্গ খাবার খান। চাল, লাল এবং অন্যান্য শাক, মসুর ডাল, সীম, তাজা ফল, সব্জি, মাছ, মাংস, গৃহপালিত মুর্গীর ডিম, বাদাম, দুধ, দই, পনীর, এ সবই পুষ্টিকর এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য।

নিরামিষ খাওয়া

নিরামিষ খাদ্য তালিকায় মাছ-মাংস থাকে না। অনেক নিরামিষাশী ডিম খান আবার অনেকে তা বর্জন করেন। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সুপরিকল্পিত নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস আমাদের শরীর ও তার ভেতরে চলা প্রক্রিয়াগুলো সচল রাখে।

শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি পুষ্টিগুণ, প্রোটিন ও ভিটামিন বি-১২, যোগানোর দিকে নিরামিষাশীদের বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন সীম, মটরশুঁটি, মুসুর ডাল, বাদাম ও দুগ্ধজাত খাবার খেলে শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন মিটবে। মাটিতে জন্মানো খাদ্যে শরীরের অতি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সীমিত পরিমাণে থাকে। শুঁটি বা বিচি জাতীয় খাবারে মিথিওনাইনের পরিমাণ কম হলেও লাইসিনের পরিমাণ বেশি থাকে। আবার চালে মিথিওনাইন এবং লাইসিন, দুটির পরিমাণই বেশি। বিভিন্ন ধরণের খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলে প্রোটিন সমৃদ্ধতা বাড়ে। মাটিতে চাষ করা খাদ্যে ভিটামিন বি-১২ থাকে না। এ জন্যে নিরামিষাশী মহিলাদের খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে ভিটামিন বি-১২ বড়ি খাওয়া উচিত।

শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী নারী, এবং সদ্যোজাত শিশুর মায়েদের শরীরে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণগুলি, বিশেষ করে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, দস্তা, ফলিক অ্যাসিড, এবং আয়রণ (লোহা) ইত্যাদি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। এছাড়া বৃদ্ধি এবং শরীরের উন্নতি সাধনের জন্যে যথেষ্ট ক্যালরি যোগান হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। কোন কোন মানুষের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, শরীরের ভেতরে চলতে থাকা রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির ধরণ, এবং শরীরের পরম্পরাগত গঠন এমনই হয় যে তাদের হয়ত মাছ-মাংস না খেলে শরীর ভাল থাকবে না। এক্ষেত্রে আপনি যদি নিরামিষাশী হন এবং মনে করেন যে আপনার খাদ্য শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি যোগাচ্ছে না, খাদ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

সম্পূরক পুষ্টি

শরীরে পুষ্টি যোগানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হল সম্পূর্ণ খাবার খাওয়া। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূরক পুষ্টিরও প্রয়োজন থাকে। জমির থেকে যে সমস্ত খাদ্যগুণ পাওয়া যায় বাণিজ্যিক চাষের ফলে তা ক্রমশঃ কমে আসে। চাষের ফসল যা খাই সেগুলো খাদ্যগুণ সংগ্রহ করে মাটি থেকে। তাই আমাদের শরীরে খাদ্যগুণের ঘাটতি থেকে যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে, কিন্তু জমির খাদ্যগুণ কমে যাওয়ার ফলে অনেক সময় ঐ খাবারগুলিও আমাদের শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি যোগাতে পারে না। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে জমির ফসল আমাদের খাবারের থালায় পৌঁছোতে অনেক সময় লেগে যায়। ফসল তোলার পর থেকেই বেশির ভাগ ফল ও সব্জির খাদ্যগুণ কমতে আরম্ভ করে। তাই

প্রতিদিন মাল্টিভিটামিন বড়ি খেলে তা সম্পূরক পুষ্টির কাজ করবে ও আমাদের পুষ্টির ঘাটতি মেটাবে। বাজারে এই ধরণের প্রচুর সম্পূরক পুষ্টি সাধক খাবার ও বড়ি পাওয়া যায়।

জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রত্যেক মহিলারই শরীরের চহিদা অনুযায়ী বিশেষ পুষ্টির প্রয়োজন থাকে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে আয়রণ (লোহা), ফলিক অ্যাসিড, এবং ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরও জানার শ্রেষ্ঠ উপায় হল খাদ্য বিশেষজ্ঞের উপদেশ নেওয়া।

সম্পূরক পুষ্টি বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়। কেউ কেউ হয়ত সম্পূর্ণ খাবার থেকে তৈরী রস, নির্যাস ইত্যাদি খেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সম্পূরক খাদ্যে যেন মিষ্টি (শর্করা), শ্বেতসার, কৃত্রিম রং এবং গন্ধ না থাকে।

প্রতিদিন ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণে কতটা খেতে হবে তা নির্ভর করে বয়স, নারী না পুরুষ, দৈনন্দিন শ্রমের পরিমাণ, ইত্যাদির ওপরে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে অনেকেই অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পান না। কিন্তু খাবার যদি সঠিক ভাবে বাছা যায়, তাহলে এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

দৈনিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের বয়সভিত্তিক বিন্যাস

বয়স/প্রকৃতি	***প্রোটিন(গ্রাম)***		***স্নেহ পদার্থ(গ্রাম)***		***ক্যালোরি***	
	প্রয়োজন	***বাস্তব***	***প্রয়োজন***	***বাস্তব***	***প্রয়োজন***	***বাস্তব***
১–৩ বছর	২২	১৮.৩	২৫	৯.২	১২৪০	৬৯৩
৪–৬ বছর	৩০	২৫.৭	২৫	১০.৯	১৬৯০	১০০৯
৭–৯ বছর	৪১	২৯.৬	২৫	১২.৮	১৯৫০	১২২০
১৮+ (পুরুষ) স্বল্প শ্রমী	৬০	৫০	১২০২১	৪	২৪২৫	২০৬৭
১৮+ (নারী) স্বল্প শ্রমী	৫০	৪৩	২০	১৭.৪	১৮৭৫	১৮৩৯
১৮+ (পুরুষ) মাঝারি শ্রমী	৬০	৫৪.১	২০	১৭.৬	২৮৭৫	২৪০৯
১৮+ (নারী) মাঝারি শ্রমী	৫০	৪৫.৬	২০	১৫.২	২২২৫	১৯৮৮
গর্ভবতী	৬৫	৪৫.৩	৩০	১৬.৬	২১৭৫	১৬৬৮
স্তন্যদায়িনী	৭৫	৪৪.২	৪৫	১৭.৩	২৪২৫	২০০৭

কিছু খাদ্যবস্তুর মধ্যে যে কয়েকটি পুষ্টি উপাদান অধিক মাত্রায় আছে (প্রতি ১০০ গ্রাম ওজন)

খাদ্যবস্তু	*প্রোটিন (গ্রাম)*	*ফ্যাট (গ্রাম)*	*ভিটামিন-এ (ই. ইউ)*	*ভিটামিন-সি (মিলিগ্রাম)*	*ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)*	*লোহা বা আয়রণ (মিলিগ্রাম)*
রাজমা	২৪.৫	–	–	–	–	–
চিনেবাদাম	৩১.৫	৪০.০	–	–	–	৪.৫
সয়াবিন	৪৩.২	১৯.৫	–	–	২৪০	১০.৪
ভুট্টা	৬.৭	৩.৭	–	–	–	–
তিল	১৮.৩	৪৩.৩	–	–	১৪৫০	১০.৫
সজনে শাক	৬.৭	–	১১৩০০			৭
কাঁটানটে শাক	৩	–	৯৩০০	–	৮০০	২২.৯
শালগম	৪	–	–	–	৭১০	২৮.৮
গাজর	–	–	৩১০০	–	–	–
আতা	–	–	–	–	৩৯৮	–
পেয়ারা	–	–	–	২১০	–	–
নারকেল	৬.৮	৬২.২	৪০০	–	–	–

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদ ও মহিলা এবং শিশু বিকাশ দপ্তর প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্যে সুষম আহারের একটা মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে। সেটি নীচে দেওয়া হল।

মহিলাদের জন্যে সুষম আহার

খাদ্যবস্তু	*স্বল্প শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*মাঝারি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*বেশি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*
তণ্ডুল (চাল, গম)	৪১০	৪৪০	৫৭৫
ডাল	৪০	৪৫	৫০
শাক-সব্জি	১০০	১০০	১০০
অন্যান্য সব্জি	৪০	৪০	৫০

খাদ্যবস্তু	*স্বল্প শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*মাঝারি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*বেশি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*
মূল ও কন্দ	৫০	৫০	৬০
দুধ	১০০	১৫০	২০০
তেল ও চর্বি	২০	২৫	৪০
চিনি ও গুড়	২০	২০	৪০

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

শিশুর সঠিক খাদ্য তালিকা

আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক সময় মনে হয় বাজার থেকে কেনা চটজলদি খাবার কিনে সময় মত শিশুদের খাইয়ে দিলেই সুবিধে। তাতে তাড়াতাড়ি কাজ চুকে যায়। তাছাড়া শিশুরাও রাস্তায় ঘাটে, টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার, যেগুলির খাদ্যগুণ অত্যন্ত কম, তার বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়ত দেখছে। সুতরাং তারা তাই খেতে চায়। বাড়ীতে এই সমস্ত খাবারের সুস্বাদু পরিবর্ত তৈরী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

আমাদের সন্তানদের সঠিক এবং সুষম খাওয়ার অভ্যাস তৈরী করতে সব চেয়ে জরুরী হল আমাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখা। রান্নাঘরে পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা ফল, শাক–সব্জি, মাখন, দই, ভুষি বাদ না দেওয়া আটা, ইত্যাদি রাখুন। ছোটবেলা থেকে এই খাবারে আপনার শিশুকে অভ্যস্ত করান। সুন্দর করে এসব রাঁধলে বাচ্চাদের খেতে ভাল লাগবে। ফল খেতে না চাইলে শিশুদের জন্যে মজার আকারে ফল কেটে দই দিয়ে খেতে দিন। তারা মজা পাবে। বাচ্চাদের নিজের হাতে খেতে দিন। এতে ওরা খেতে শিখবে এবং নিজেদের প্রতি দায়িত্ববান হবে।

কোন শিশুর কখন খিদে পেয়েছে বা কখন পেট ভর্তি রয়েছে তা তাকেই বুঝতে দেওয়া দরকার। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এই বিশ্বাস তাকে বড় হওয়ার পর বাকি জীবনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাবে।

বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে খাবারের মেনু বানান, তাদের নিয়ে বাজার করুন, চাষের প্রক্রিয়া দেখান, তাদের সামনে রান্না করুন। তাহলে খাবারের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ জন্মাবে। প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার কিনলে প্যাকেটের গায়ে আঁটা লেবেলে উপদানগুলির নাম আপনার শিশুকে পড়তে দিন। শহরে বাস করলেও শিশুদের টবে গাছ লাগাতে শেখান যাতে তারা ফসল তৈরীর ব্যাপার বুঝতে শেখে। শিশুর যদি রান্নায় আগ্রহ থাকে তাকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে দিন।

শিশুদের কতটা দৈনিক পুষ্টির উপাদান প্রয়োজন

	শিশু		*ছেলে*	*মেয়ে*
	৪–৬ বছর	*৭–৯ বছর*	*১০ – ১২ বছর*	*১০ – ১২ বছর*
শারীরিক ওজন (কেজি)	১৯	২৭	৩৫	৩১
মোট শক্তি (ক্যালোরি)	১৬৯০	১৯৫০	২১৯০	১৯৭০
প্রোটিন (গ্রাম)	৩০	৪১	৫৪	৫৭
তেল বা চর্বি(গ্রাম)	২৫	২৫	২২	২২
ক্যালসিয়াম(মিগ্রা)	৪০০	৪০০	৬০০	৬০০
লোহা বা আয়রণ(মিগ্রা)	১২	১৮	২৬	৩৪
ভিটামিন–এ (ইইউ)	৪০০	৪০০	৬০০	৬০০

শিশুদের জন্য দৈনিক সুষম খাদ্যের সঠিক পরিমাণ

খাদ্যবস্তু	*শিশু*		*ছেলে*	*মেয়ে*
	৪–৬ বছর	*৭–৯ বছর*	*১০–১২ বছর*	*১০–১২ বছর*
	পরিমাণ(গ্রাম)	*পরিমাণ(গ্রাম)*	*পরিমাণ(গ্রাম)*	*পরিমাণ(গ্রাম)*
তণ্ডুল (চাল বা গম)	২৭০	৩৫০	৪২০	৩৮০
ডাল	৩৫	৪০	৪৫	৪৫
পাতাসমেত শাক–সব্জি	৫০	৫০	৫০	৫০
অন্যান্য সব্জি	৩০	৪০	৫০	৫০
মূল ও কন্দ	২০	২৫	৩০	৩০
দুধ	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
তেল ও চর্বি	২৫	৩০	৪০	৩৫
চিনি ও গুড়	৪০	৪০	৪৫	৪৫

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

ডায়েটিং (খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ)

টেলিভিশন ও রাস্তার পাশে অ্যাড বোর্ডে, ফ্যাশন পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, এমন কি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পুস্তিকাতেও আজকাল আমাদের শরীরের ওজন যাতে কম থাকে তা নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞাপনে বলা হয় কি খেলে মানুষ ভালো থাকে এবং এ সব থেকে মনে হতে পারে রোগা মানুষই কেবল সুন্দর ও ভালো। ব্যক্তি হিসেবে আমাদের মূল্যায়ন আমরা কি খাই তার ওপর কখনই নির্ভর করে না। ডাক্তারী বা স্বাস্থ্য বীমার জন্যে তৈরী ওজন বিষয়ক তালিকাতেও প্রতি ব্যক্তির শরীরের গঠন ও জেনেটিক্সের কথা মাথায় রাখা হয় না। ফলে আজকাল অনেকের মধ্যে ওজন নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, বিশেষ করে কমবয়সী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে।

ক্যালরি কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ

কম খেয়ে ক্যালরি কমানো ওজন নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে চালু প্রথা। কখনও কখনও এই ক্যালরি কমানোর পদ্ধতি প্রায় স্বেচ্ছা অনাহারের পর্যায়ে পড়ে, তাই এগুলি বেশিদিন অভ্যাস করা যায় না। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্যে কোন কোন ওজন কমানোর প্রতিষ্ঠান এমন স্বল্প ক্যালরি যুক্ত খাদ্য তালিকা তৈরী করে যে ঐ তালিকা অনুসরণ করলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওজন কমে যায়। কিন্তু এমন ভাবে খাওয়া কমালে শরীর এই অবস্থায় ভেবে বসে দুর্ভিক্ষ চলছে, ফলে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ পাক প্রক্রিয়াগুলির গতি ধীর হয়ে যায় যাতে আমরা ঐ স্বল্প ক্যালরি খেয়েই বেঁচে থাকতে পারি। এর পর যখন আবার যথেষ্ট ক্যালরি যুক্ত খাবার খেতে শুরু করি, আমাদের শ্লথ পাকপ্রক্রিয়া অতি ধীরে এই খাদ্য হজম করে এবং ফলে আমাদের ওজন বেড়ে যায়। তাই এ ধরণের ওজন কমানোর পদ্ধতি অনুসরণ করলে ক্যালরি কম পেয়ে আমাদের বিপাকীয় ব্যবস্থার গতি কমে যায় এবং ওজন বাড়ার লক্ষণ থেকেই যায়। এর ফলে আমরা ভাবি এত কষ্ট করেও আমাদের ওজন কেন কমছে না। এমন কি খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার আগে যত মোটা ছিলাম তার চাইতেও বেশি মোটা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বেশি কার্বোহাইড্রেট এবং কম স্নেহ–জাতীয় পদার্থ যুক্ত খাবার খাওয়া

ক্যালরির বিধি–নিষেধ মুক্ত এই ধরনের খাবার যারা প্রচুর কার্বোহাইড্রেট সহ্য করতে পারেন তাদের পক্ষেই উপযোগী। তবে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের মত এই কার্বোহাইড্রেট ফল, সব্জি ও সম্পূর্ণ শস্যের মাধ্যমেই খাওয়া উচিত। অবশ্য অনেকেই স্নেহ জাতীয় খাদ্যের বিকল্প হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ করা শর্করা যুক্ত খাবার

খেয়ে থাকেন। তাঁরা প্রাতরাশের সময়ে ডিম, সব্জি এবং ভুষিযুক্ত গমের রুটির বদলে ময়দার তৈরী পাঁউরুটিতে জ্যাম লাগিয়ে খেয়ে নেন। এতে হয়তো কম ক্যালরি রয়েছে এবং এ খাবার তাৎক্ষণিক শক্তি যোগাবে, কিন্তু এর পুষ্টিগুণ এবং শরীরকে চালু রাখার ক্ষমতা ডিমসহ সুষম প্রাতরাশের তুলনায় অনেক কম।

বেশি প্রোটিন এবং কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া

এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসও ক্যালরির বিধি–নিষেধ মুক্ত ও শরীরের ওজন কমানোর প্রক্রিয়া হিসেবে প্রচলিত। অনেকে মনে করেন যে তিনি যত খুশী প্রোটিন ও স্নেহযুক্ত খাবার খেতে পারেন, এতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু শুধুই মাংস জাতীয় খাবার খাওয়া বিধেয় নয়। মাছ মাংসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ফল ও সব্জি খেলে পরেই সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে। যাঁরা বেশি প্রোটিন যুক্ত খাবার খেয়ে উপকৃত হন, তাঁরা প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার বাদ দিয়ে, শুধু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ একটু বাড়ালে একই রকম ভালো বোধ করবেন। বহুল প্রচারিত বেশি প্রোটিন যুক্ত, প্রক্রিয়াকরণ করা তথাকথিত স্বাস্থ্যকর খাদ্যগুলি থেকে দূরে থাকুন। এই খাদ্যগুলির অধিকাংশেরই উপকরণ হল কৃত্রিম উপায়ে তৈরী অপুষ্টিকারক হাইড্রোজেনুযুক্ত তেল, কৃত্রিম গন্ধ, রঙ এবং শর্করাযুক্ত উপাদান।

অনেকে মনে করেন ওজন কমার ফর্মূলা হল কতটা ক্যালরি খেলাম এবং কতটা খরচ করলাম তার অনুপাত। আসলে আমাদের শরীরের ওজন নির্ধারিত হয় কয়েকটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বংশ পরম্পরাগত শরীরের গঠন, বিশেষ বিশেষ খাবারে প্রতিক্রিয়াশীলতা, এবং খাদ্যের দ্রব্যগুণ, এ সবেরই শরীরের ওজন বাড়ানো বা কমানোয় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বংশ–পরম্পরাগত শারীরিক গঠন

প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন মানুষের শরীরের গঠন বিভিন্ন। কারোর কাঠামো ছোট, কারোর বড়সড়। আপনার পরিবারের অধিকাংশ মহিলার গঠন যদি ভারী হয়, তাহলে আপনার মোটা হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত পূর্বনির্দিষ্ট।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী খেতেন তা দেখে নিজেদের জন্যে একটা যথাযথ খাদ্য–তালিকা আমরা তৈরী করতে পারি। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে আমরা জেনেছি যে সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী অসুখের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক রয়েছে (যেমন ডায়াবেটিস বা মদ্যপানে আসক্তি) সেগুলি অনেক সময়েই বংশ–পরম্পরাগত।

আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ খাবারের প্রতিক্রিয়াশীলতা (অ্যালার্জি)

আমাদের শরীর যদি বিশেষ কিছু খাদ্যের প্রতি স্পর্শকাতর বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়, সেগুলি আমরা হজম করতে পারি না। আমরা যদি ঐ ধরনের খাবার খেতেই থাকি তাহলে আমাদের হজমের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যথাযথ ভাবে কাজ করে না। এর ফলে কোন কোন সময় আমাদের ওজন বেড়েও যেতে পারে।

এই প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণত দু ধরণের হয়। প্রথমটি হল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিছু কিছু প্রোটিন যুক্ত খাদ্যকে ক্ষতিকারক মনে করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। ফলে একাধিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যেমন ত্বকের উপর ছোটখাট ফুসকুড়ি ও আমবাত থেকে শুরু করে ফুসফুস ও বাতাস চলাচলের পথগুলি ফুলে বন্ধ হয়ে যাওয়া। তবে সবচাইতে ভয়ানক হল অ্যানাফাইল্যাকটিক শক বা প্রতিক্রিয়া। সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থটির একটুখানি স্বাদ, ত্বকের সাথে স্পর্শ, বা কোন কোন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপস্থিতি, বা অন্য কোন উপায়ে শরীরের সাথে সংযোগ ঘটলে শরীরের মধ্যে চালু প্রক্রিয়াগুলি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ধরণের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া প্রধানত মটর, বিভিন্ন বাদাম, খোসাওয়ালা মাছ যেমন শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি খেলে হয়। আপনার বা আপনার সন্তানদের কোন খাবার খেয়ে যদি এরকম ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে এ খাদ্যগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের প্রতিক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারদের নির্ধারিত ওষুধ সঙ্গে রাখাও বাঞ্ছনীয়। সময়বিশেষে এই ওষুধ জীবনদায়ী হয়ে ওঠে।

শরীরের প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধরণটি হল বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রতি আমাদের স্পর্শকাতরতা। এই প্রতিক্রিয়ায় জীবনের ঝুঁকি না থাকলেও এগুলিকে চিহ্নিত করা কঠিন। এই প্রতিক্রিয়াগুলির লক্ষণ হল পেশী ও গাঁটে ব্যথা, শ্লেষ্মা জমে যাওয়া, ফুস্কুড়ি বা একজিমা হওয়া, মাইগ্রেন বা ভয়ানক মাথা ব্যাথা করা, ক্লান্তি, আন্ত্রিক গোলযোগ, এমনকি মানসিক অবসাদ। এই প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি কোন বিশেষ খাবার খাওয়ার ৭২ ঘন্টা পরেও দেখা দিতে পারে। সাধারণত দুধ, ডিম, সামুদ্রিক খাদ্য, গম, বাদাম, শুঁটিজাতীয় খাবার, চকলেট, কমলালেবু, টোম্যাটো, ভুট্টা ইত্যাদি খাবারে এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এগুলিকে চিহ্নিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রাত্যহিক খাদ্য–তালিকা থেকে সম্ভাব্য খাবারগুলো দশ থেকে চৌদ্দ দিন বাদ দিন। তারপরে খাবারগুলিকে খাদ্য তালিকায় একে একে যোগ করুন। মনে রাখতে হবে যে এই খাবারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শরীরে না গেলে প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে, কিন্তু নিয়মিত খেতে আরম্ভ করলে হয়ত আবার তা দেখা দেবে। তখন সেগুলিকে আবার বাদ দিতে হবে। এই চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই আপনার শরীরে সমস্যা ঘটাতে পারে এরকম খাবার চিহ্নিত করতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শিশু অবস্থায় মায়ের বুকের দুধ খেলে শরীরে খাদ্যের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা খানিকটা তৈরী হয়ে যায়।

খাদ্যাভ্যাস-জনিত অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা

আজকের পৃথিবীতে আমরা অনেকেই আমাদের ওজন নিয়ে বিব্রত হই। অত্যাধিক ওজন হৃদ-রোগ, রক্ত-চাপ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, এমনকি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, বিশেষ করে ওজন বাড়তে না দেওয়া আমাদের মন ও শরীর ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। তবে স্থূলতাজনিত সমস্যাগুলির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময়ে অতিশয়োক্তিও করা হয়। যে সমস্ত স্থূলকায় মানুষ প্রত্যেকদিন ব্যায়াম করেন তাঁদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় না।

ওজন কমানোর জন্য সবচাইতে চালু নিদান হল খাদ্যতালিকার কাটছাঁট। তাই ওজন যন্ত্রের কাঁটার দিকে নজর না দিয়ে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য খান, ব্যায়াম করুন ও শরীরের প্রতি যত্নশীল হোন।

> আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও সমাজের চাপে আমাদের দেশের বিধবা নারীদের অনেকেই মাছ-মাংস ছুঁতে পারেন না, অকারণে মাঝেমধ্যেই উপবাস করেন। সমাজের এই কুপ্রথা শুধু অমানবিক নয়, নারীর স্বাস্থ্যকে সার্বিক ভাবে ধ্বংস করে। নিজেদের শরীরের প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে স্বামীহারা নারীদের এই সব নিষ্ঠুর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করা উচিত।

খাওয়া ও না-খাওয়ার অসুখ

খাওয়াটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেইজন্য আমরা খাই। খেতে আমাদের ভালো লাগে, তাই স্বাস্থ্যরক্ষাটা খুব স্বাভাবিক উপায়ে হয়। অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করলেও খরচের কথা ভেবে সবকিছু সবসময়ে খাওয়া সম্ভব হয় না। তাও মাঝে মাঝে বিলাসিতা করে আমরা ভালোমন্দ অনেক কিছু খেয়ে ফেলি, কষ্ট পেলে মনকে চাঙ্গা করতে ভালো ভালো খাবার খাই, আবার অতি দুঃখে খাওয়াদাওয়া বর্জন করি। এক এক সময়ে যখন একাকিত্বে ভুগি, মনমরা হয়ে থাকি, পৃথিবীটাকেই বিস্বাদ লাগে, তখন খাবার দেখলে আমাদের বমি পায়। আরেক সময়ে যখন মন প্রফুল্ল থাকে, তখন বেশি বেশি খেতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ ভালোমন্দ খাওয়া বা যা খাচ্ছি তার পরিমাণ শুধু শরীরের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না, এর পেছনে মানসিক তাগিদ থাকে। মনকে তুষ্ট রাখতে অনেক সময়েই আমরা খাদ্য ব্যবহার করি। কিন্তু শুধু ইচ্ছার তাড়নায় খাওয়া দাওয়া করলে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য দুটোই বিপর্যস্ত হয়।

আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক সময়ে বিভিন্ন সমস্যার (যেমন স্ট্রেস্ বা মানসিক চাপ, ক্রোধ, মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন, নিজেদের অপর্যাপ্ততা, অস্পৃশ্যতা বা জাত–পাত জনিত গোলযোগ ইত্যাদি) সঙ্গে যুঝতে খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁরা হয় খাওয়া বন্ধ করে দেন অথবা বেশি খেতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে খাদ্যকে ব্যবহার করা এক ধরণের অসুস্থতা, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যাকে ইটিং ডিস–অর্ডার বলে।

নীচে যেসব খাদ্য সংক্রান্ত অসুখের কথা বলা হচ্ছে, তাদের মূলে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা যুক্ত থাকে।

খাবার সংক্রান্ত দুটি বড় অসুখের সঙ্গে পাশ্চাত্য সৌন্দর্যবোধ জড়িত। এককালে আমাদের দেশে মেয়েদের গোলগাল চেহারা, আর্থিক সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল। সুন্দরী রাজকন্যারা কখনো এখনকার মডেলদের মতো রোগা হতেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রভাবে এখন রোগা থাকাটাই সৌন্দর্যের মাপকাঠি হয়েছে। টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকার দয়ায় মডেল ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দেখে তাদের মত দেখতে হওয়ার বাসনা এ যুগের প্রায় সব মেয়েদের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তাই ডায়েট করে রোগা থাকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেক সময়েই ডায়েট করতে গিয়ে সুষম খাবার না খেয়ে তাঁরা শরীরের ক্ষতি করছেন।

কতগুলো খাদ্য–সংক্রান্ত অসুখ

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা

অ্যানোরেক্সিয়া এক ধরণের খাবার সংক্রান্ত রোগ যা জটিল শারীরিক ও মানসিক কারণে হয়। যাঁরা অ্যানোরেক্সিয়ায় ভোগেন তাঁরা একেবারেই খেতে চান না। সব সময়েই তাঁদের ভয় যে এই বুঝি ওজন বেড়ে যাবে, সে যত রোগাই হন না কেন। নিজেদের শরীর সম্পর্কে তাঁরা বিকৃত ধারণা পোষণ করেন। অ্যানোরেক্সিয়া মূলত মহিলাদের রোগ এবং আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। অসুখটি সাধারণত শুরু হয় বয়ঃসন্ধিকালে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি বয়সেও এই রোগ দেখা দিতে পারে। ঠিকমত চিকিৎসা না করলে এটি সারা জীবন চলে। এর ফলে অনেক সময় নানান শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়, এমন কি রোগীর প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

অ্যানোরেক্সিয়ার লক্ষণগুলি হল

- ওজন বেড়ে যাবে বলে অহেতুক ভীতি এবং সে জন্যে খাওয়াদাওয়া কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- বয়স এবং গড়ন অনুপাতে স্বাভাবিক ওজনের থেকে ওজন অনেক কম হওয়া। অনেক সময় ওজন স্বাভাবিক ওজনের ৮৫ শতাংশ বা তার থেকেও কম হয়ে যায়।
- ওজন কমাতে অত্যাধিক ব্যায়াম করার প্রবণতা।
- খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা আছে তা অস্বীকার করা।

অ্যানোরেক্সিয়ার রোগীরা সাধারণত কোন ডাক্তারের কাছে যেতে চান না, কারণ তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ। কারোর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমতে থাকলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অ্যানোরেক্সিয়া যথেষ্ট ভয়াবহ রোগ এবং এর কোনও ওষুধ নেই। দরকার ভালো কাউন্সেলিং ও ঠিকমত খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্য–গুণাগুণ বিচারের ব্যাপারে রোগীকে বুঝিয়ে সাহায্য করা। অনেক ক্ষেত্রে রোগী যদি দুশ্চিন্তা বা মানসিক অবসাদে ভোগেন ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। এই অসুখে আক্রান্ত মহিলা বা পুরুষ অনেক সময় এমন কোনও পেশায় কর্মরত থাকেন যেখানে ওজন নিয়ে সকলেই খুব ব্যতিব্যস্ত হন, যেমন মডেলিং, অভিনয়, নৃত্য–জগৎ ইত্যাদি। (সূত্রঃ অবসর ওয়েবসাইট)

বুলিমিয়া নার্ভোসা

এই অসুখের রোগীরা অতি দ্রুত বেশি খেয়ে ফেলেন এবং তারপর চেষ্টা করেন সেই খাদ্যবস্তুকে বমি করে ও জোলাপ ইত্যাদি খেয়ে শরীর থেকে বর্জন করতে। সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে এই দ্রুত–ভোজন এবং খাদ্য নিষ্কাশনের চক্র স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে থাকে যার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিয়মিত বমি করার ফলে অ্যাসিড বা পেটের অম্ল দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে আর দাঁত এবং মাড়ির অসুখ ঘটায়। যে কোন রকম অস্বাভাবিক খাদ্য–নিষ্কাশন পদ্ধতি, বমি বা অতিমাত্রায় জোলাপ খাওয়া হাড়ের ক্ষয় ঘটায়, বৃক্ক বা কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত করে ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে। এইসব কারণে বুলিমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে।

খাদ্য সংক্রান্ত অসুখ কেন হয় নিশ্চিত ভাবে এখনও জানা যায় নি। সামাজিক আবহাওয়া, পারিবারিক ধারা, ব্যক্তিমানসিকতার প্রভাব এই সব অসুখের ওপর রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বুলিমিয়া রোগীরা দ্রুত খান, কারণ খাবারের

মধ্যে তাঁরা তৃপ্তি খুঁজে পান, আবার খাবার পরেই তাঁদের মধ্যে মোটা হয়ে যাবার ভয় এবং অপরাধবোধ কাজ করে। তাই সেই খাবার শরীর থেকে দ্রুত বের করে ফেলতে তাঁরা তৎপর হন। এই ব্যাখ্যাটি কিছুটা সরলীকৃত হলেও মোটামুটি ভাবে সঠিক।

সাধারণত কমবয়সী মেয়ে যারা নিজেদের দেহ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে (১৪ থেকে ১৮ বছর), তাদেরই এই সব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আসলে এই বয়সটিতে এত মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন আসে যে জীবন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে তাদের ভয় হয়। ওজনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এনে কেউ কেউ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চায়। বিশেষ করে মেয়েদের এই সময়ে মেদবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনেক মেয়ে এই ওজন বৃদ্ধিতে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ ক্ষীণকায়া মডেল বা চিত্রাভিনেত্রীদের দেখে দেখে তারা সেইরকম গঠনই আদর্শ বলে মনে করে। তবে বুলিমিয়া সব বয়সেই হতে পারে এবং কিছু কিছু পুরুষও এই রোগে ভোগেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে যাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি

- যদি পরিবারের এক বা একাধিক মানুষ অতি-স্থূল বা মোটা হন, অথবা তাঁদের খাদ্য-সংক্রান্ত সমস্যা থাকে, অথবা তাঁরা মানসিক অবসাদ (ডিপ্রেশন) বা দুশ্চিন্তারোগে ভোগেন।
- যাঁরা এমন সব শিল্প বা কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত যেখানে দেহ-সৌষ্ঠবের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় যেমন মডেলিং, নৃত্য, অভিনয়, ইত্যাদি।
- যাঁরা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, কোথাও ত্রুটি দেখলে অস্বস্তিতে ভোগেন।
- যখন বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, প্রিয়জনের মৃত্যু, চাকরির পরিবর্তন, ইত্যাদির জন্যে কোন বিশেষ মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য সংক্রান্ত রোগ ধরা অনেক সময়ে কঠিন হয়। এই রোগে বাইরে থেকে শরীরের অস্বাভাবিকতা খুব একটা চোখে পড়ে না। বুলিমিয়া রোগীরা দেখতেও স্বাভাবিক। অনেক সময়ে কম বয়সী বুলিমিয়া রোগীরা গোপনে দ্রুত খাবার সারে যাতে বাড়ির কেউ সেটা জানতে না পারেন। বুলিমিয়ার যে লক্ষণগুলি খেয়াল করলে চোখে পড়ে সেগুলি হল:

- দ্রুত খাবার পরেই বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করা।
- অত্যাধিক খাওয়া সত্ত্বেও ওজন না বাড়া এবং অন্যের সামনে না খেয়ে একলা খেতে পছন্দ করা।

- অত্যাধিক ব্যায়াম আরম্ভ করা।
- ডায়েটিং, ওজন বা রোগা থাকা নিয়ে সর্বদা কথা বলা।
- জোলাপ জাতীয় ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার আরম্ভ করা। প্রায়ই বমি করা, বিশেষ করে খাওয়ার পরে।

বুলিমিয়া অসুখ সারাতে কাউন্সেলিং এবং অনেক সময়ে ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ রোগে যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা সুরু করা যায় ততই ভালো। এটি সারতে সময় লাগে। যদি কেউ নিজে মনে করেন যে খাবার ব্যাপারে তাঁর সমস্যা হচ্ছে, তাহলে নিজের চিকিৎসা নিজে না করে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।

দ্রুত এবং বেশি খাওয়ার অসুখ বা বিঞ্জ ইটিং বুলিমিয়ার মতই একটি সমস্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি অনেক খাওয়ার পর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বমি করা বা জোলাপ খাওয়ার ব্যাপারটা নেই। যাঁরা এই সমস্যায় ভোগেন সাধারণত প্রতিদিন অতিভোজন না করে সপ্তাহে বার দুই এরকম করে থাকেন। (সূত্রঃ অবসর ওয়েবসাইট)

ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে যে শারীরিক সমস্যার সমাধান করা যায়ঃ

পেটের অসুখ

অনেক মহিলারা হঠাৎ হঠাৎ পেটের অসুখে ভোগেন। এ ধরণের পেট খারাপের কারণ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, ক্রোনস অসুখ, বা আলসারেটিভ কোলাইটিস হতে পারে। এইগুলি আমাদের খাদ্য এবং দুশ্চিন্তার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। ক্ষেত্র বিশেষে এ জন্যে স্টেরয়েড ওষুধ খেতে হয় বা অপারেশনও করাতে হয়। তবে হঠাৎ হঠাৎ পেট খারাপের মূলে অনেক সময়েই দুগ্ধজাত খাদ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা বা ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স থাকে। অনেকের শরীরে দুধ বা ল্যাকটোজ যুক্ত খাদ্য হজম করার ক্ষমতা থাকে না। আবার গমজাত খাবারে অ্যালার্জিও এর কারণ হতে পারে। এই সংবেদনশীলতা অবশ্য পরীক্ষা করে সব ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায় না। যে সব খাবারে আঁশ বেশি আছে, অনেক সময় সেগুলি খেয়ে উপকার পাওয়া যায়। নিজেরাই নানা জিনিস খেয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে কোনটি খেলে শরীর সবচেয়ে ভাল থাকছে তা বের করতে পারেন।

দাঁত ও মাড়ির ক্ষয়

আজকাল যদিও দাঁত বাঁধানো প্রচলিত হয়েছে ফলে খাবার চিবিয়ে খেতে অসুবিধে হয় না, নিজের দাঁত থাকা খাদ্য হজমের পক্ষে অনেক ভালো। দাঁত শরীরের এক জীবন্ত অঙ্গ। মুখের লালা দাঁতের পুষ্টি যোগায়। দাঁতের স্বাস্থ্য অনেক

দিক থেকে আমাদের গোটা শরীরের সুস্থতার প্রতীক। মাড়ির অসুখের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক রয়েছে। মাড়ির সুস্থতা বিভিন্ন পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল, যেমন জিঙ্ক (খনিজ), ভিটামিন–সি, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। মুখের বীজাণু খাদ্যের সঙ্গে মিশে দাঁতের ওপর ক্ষতিকারক ছাতা সৃষ্টি করে। নিয়মিত দাঁত মেজে তা পরিষ্কার করতে হয় নইলে দাঁত ও মাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের দেশে খৈনী, গুটকা, পান পরাগ, জর্দা, পান–সুপারী ইত্যাদি খাওয়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। দাঁত এবং মাড়ির পক্ষে এগুলি খুবই ক্ষতিকরক। মুখের মধ্যে তামাক জাতীয় পদার্থ (যেমন খৈনী, গুটকা, পান পরাগ, জর্দা ইত্যাদি) যাঁরা বহুক্ষণ রেখে দেন, তাঁদের মুখের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বেশি।

মাইগ্রেন বা সংঘাতিক মাথা ধরা

খাবারে যখন মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, টাইরামাইন ইত্যাদি থাকে অনেকের মাইগ্রেন হয়। চকলেট, লাল মদ, পাকা কলা, পুরনো চীজ, মুরগির মেটে ইত্যাদিতে এসব বেশি থাকে। সবারই যে এগুলো খেলে মাইগ্রেন হবে তা নয় এবং এগুলোই যে মাইগ্রেনের একমাত্র কারণ তাও নয়। তবে এসব খাবার সময়ে খেয়াল রাখবেন আপনার মাইগ্রেন হচ্ছে কিনা। হলে এগুলি খাবে না।

অস্টিওপোরোসিস (অস্থি নরম হয়ে যাওয়া)

অস্টিওপোরোসিস এক ধরণের অসুখ যাতে ধীরে ধীরে শরীরের অস্থি বা হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। এর ফলে অনেক সময়ে শিরদাঁড়া, কোমরের নীচের হাড় বা উরুসন্ধি ভেঙ্গে যেতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে এই রোগ জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের শরীরে সব সময়েই অস্থি–ক্ষয় ঘটে আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় নতুন অস্থি। কম বয়সে যা ক্ষয় হয় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ নতুন অস্থি যোগ হয়। সেই জন্যে শিশু বয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে দেহে অস্থির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বয়স বাড়তে বাড়তে ধীরে ধীরে সেই বৃদ্ধি কমতে থাকে। তিরিশ বছর বয়সে এই অবস্থার গতি উল্টো হয়; অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে অস্থির শুধু ক্ষয় হতে থাকে প্রথমে আস্তে, তারপর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে। যত বয়স বাড়ে শরীরের অস্থিগুলি ধীরে ধীরে পাতলা হতে শুরু করে। তবে সাধারণভাবে এই রোগ প্রকট হয় যদি ছেলেবেলায় অস্থিগুলি আদর্শ ঘনত্বে না পৌঁছোয়। যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন–ডি, এবং ফসফরাসের অভাব হাড়ের এই ক্ষয়ক্ষতিকে তরান্বিত করে।

এছাড়া **৫০** বছর বয়সের পরে মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেন হর্মোনের এবং পুরুষদের শরীরে টেস্টোস্টেরন হর্মোনের অভাব অস্থির ক্ষয়কে দ্রুত করে। ব্যক্তিবিশেষে এই রোগ হবার সম্ভাবনা ভিন্ন হয়। সাধারণত যাদের বাবা-মা বড় ভাই-বোনের অস্টিওপোরোসিস হয়েছে, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি।

অস্টিওপোরোসিস-এর রোগ-লক্ষণ চট করে চোখে পড়ে না। অসুখ বাড়ার সাথে সাথে লক্ষণগুলি প্রকট হতে থাকে। এর কতগুলো লক্ষণ হল:

- পিঠে ব্যথা
- বেঁটে হয়ে যাওয়া
- শরীর বেঁকে সামনে ঝুঁকে পড়া
- অল্প আঘাতেই হাড় ভাঙ্গা, বিশেষ করে উরুসন্ধি, কব্জি ও শিরদাঁড়ার হাড়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড় পাতলা হয়ে যাওয়া শরীরের ধর্ম, তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার গতিকে মন্থর করা যায় ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করে, নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি করে। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীরের হাড় শক্ত হয়। এছাড়া অন্যান্য কিছু ওষুধ রয়েছে যা অস্থি-ক্ষয়ের গতি কমিয়ে দেয়। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)